বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯২ সালে গাজীপুর জেলার বোর্ডবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন দশক পরে দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষা ও গবেষণা নয় বরং অব্যবস্থাপনার প্রসার ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি শুরুতেই উচ্চশিক্ষার ধারণাগত বিভ্রান্তি নিয়ে শুরু হয়েছিল নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণা ছাড়া। অথচ বিশ্বের অনেক দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মানে প্রথম সারির একটি গবেষণানির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক উল্টোটা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ ও অধিভুক্তি বাণিজ্য বর্তমানে অসহনীয় মাত্রায় পৌঁছেছে। কথা ছিল, অন্তর্ভুক্ত কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয় করবে; মূল কাজ করবেন স্ব স্ব কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। অথচ আজ বিশ্ববিদ্যালয়টির হস্তক্ষেপে কলেজগুলোর স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত ও বিভ্রান্ত; ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে অসহায় ও চাপা ক্ষোভ। অনার্স-মাস্টার্স পর্যায়ের ছাত্র-শিক্ষকের জ্ঞানের আদান-প্রদানের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কেন্দ্রীয় কোনো ব্যবস্থার কর্মকর্তাদের এত নির্দেশনা পৃথিবীর অন্য কোথাও হয় কিনা আমার জানা নেই।

প্রিন্ট মিডিয়াতে তো আছেই, সম্প্রতি ডিবিসি ও বৈশাখী টিভির ধারাবাহিক সচিত্র প্রতিবেদনেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার ভয়ংকর অনেক তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানে যে কেউ অন্যায় করলেই দায় উপাচার্যের তা বলছি না। দায় না থাকলেও এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব তো অবশ্যই আছে। কিন্তু প্রকাশিত দুর্নীতি না থামিয়ে এবং অভিযুক্তের বিচার না করে, দিনের পর দিন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান (উপাচার্য) তার সংশ্লিষ্টতা বা দায় এড়াতে পারেন না। যেমন- অর্ধশতাধিক জ্যেষ্ঠ শিক্ষক কর্মকর্তা থাকতে বর্তমান উপাচার্য এক সহকারী রেজিস্ট্রারকে প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন, যিনি কিনা ২০০৭ সালের অনার্স পার্ট-২ ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা হওয়ার দুই বছর পেরিয়ে গেলেও অনেক সময় নিয়োগ সম্পন্ন হয় না; এর মধ্যে নাকি চলে বাণিজ্যের দরকষাকষি।

অভিযোগ উঠেছে, নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ এক শাখার মাধ্যমে যত্রতত্র নতুন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার বা অনার্স ও ডিগ্রি (পাস কোর্স) খোলার অনুমতি দিচ্ছে। এই বিশেষ শাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও অর্গানোগ্রামবহির্ভূত বলে প্রতিবেদন বেরিয়েছে (২৭ জুন, ২০১৩, যুগান্তর)। সরেজমিন পরিদর্শনে প্রতিবেদক দেখেছেন, অধিভুক্তির অনুমোদন পাওয়া অনেক প্রতিষ্ঠানের কার্যত কোনো অস্তিত্ব নেই। এ রকম অবিবেচনাপ্রসূত ও বাণিজ্যিক বিবেচনায় যাদের এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদন দিচ্ছে, তাদের অনেকেই শিক্ষানুরাগী নন। ফলে তাদের বাণিজ্যিক স্বপ্ন আজ দেশের উচ্চ শিক্ষার দুঃস্বপ্নে রূপান্তরিত হয়েছে।

একসময় কলেজে যথেষ্ট শিক্ষক ও অবকাঠামোর অভাবকে সেশনজটের কারণ হিসেবে দাবি করা হতো। অথচ এই কারণের সংকট নিরসন না করে এর প্রভাব, সেশনজট কীভাবে 'নাই' হয়ে গেল সেটিই এখন একটা বড় নৈতিক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে! টিভি ক্যামেরার সামনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের এক ছাত্র দাবি করেছে, পাঁচ বছরের অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষাজীবনে তারা ক্লাস করেছে মাত্র বারো দিন। অনেক কলেজের শিক্ষকের সঙ্গে আমি নিজে কথা বলেছি। তাদের মতে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজগুলোকে যেভাবে ব্যবস্থাপনা করছে, তাতে যথেষ্ট সংখ্যক ক্লাস নেওয়ার সময় তাদের হাতে থাকে না। এ বিষয়ে কলেজের শিক্ষকরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধু কর্মকর্তা, এমনকি কর্মচারীদের কাছে অসহায়। ভুক্তভোগী এক শিক্ষার্থী দাবি করেছে, মাত্র তিনশ টাকা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়নকে দিলেই মেলে ইনকোর্স নম্বর। অথচ এই নম্বর শ্রেণি শিক্ষকের এখতিয়ারের বিষয় যা ক্লাসেই নির্ধারণ হওয়ার কথা।

ভবন নির্মাণ কাজে কোটি কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিল্ডিং নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের মেরিট যাচাই করে তুলনামূলক বেশি দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়ার অজুহাতও এখানে দেওয়া যাচ্ছে না। এ রকম কোনো সদিচ্ছা থাকলে, যে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিখ্যাত কেলেঙ্কারিতে জেলে আছেন, সে প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হতো না। এই কাজ বাধাহীনভাবে করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলীকে চাকরিচ্যুত করার অভিযোগ উঠেছে।

উপাচার্য নিয়োগ প্রজ্ঞাপনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে (গাজীপুরে) অবস্থানের শর্ত থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বা তার আশপাশে উপাচার্যের বাসভবনের ব্যবস্থা না করে ৩০ কিলোমিটার দূরে ধানমন্ডি, ঢাকায় উপাচার্যের অফিস কাম বাসভবন, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করাকে খোদ সরকারের নিরীক্ষা কমিটি নীতিগতভাবে আপত্তি জানিয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ নিয়ে গবেষণা হবে এটি খুবই ভালো উদ্যোগ, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ক্যাম্পাস থাকতে এরকম একটি প্রতিষ্ঠান উপাচার্যের বাসভবনে হতে হবে কেন?

আমাদের শিক্ষা উপমন্ত্রী বলেছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষের এসব দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখবেন। এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনেও একাধিক অভিযোগ আছে বলে শুনেছি। আশা করি সরকার খুব দ্রুতই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে এবং আমাদের উচ্চশিক্ষাকে রক্ষা করবে। আপাতত যত্রতত্র বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স অনুমোদন দেওয়া বন্ধ করতে হবে। কারণ, দেশের আর্থসামাজিক ও বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতায় মৌলিক বিষয়ের বাইরে কোনো বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করলে অবশ্যই চাকরির বাজারে এর চাহিদা বিবেচনায় নিতে হবে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলো বেকার তৈরির কারখানা হতে বাধ্য। পাশাপাশি, প্রতি জেলায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় করার বাস্তবতায় এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা সেটি নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। আগের অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা বলতে পারি, অনার্স-মাস্টার্স আছে এমন কলেজগুলোকে স্ব স্ব জেলা বা অঞ্চলের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করে দিলে বরং বর্তমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অব্যস্থাপনা থেকে প্রতিষ্ঠানগুলো বেঁচে যাবে, দুর্নীতিও অনেকটা সহনীয় মাত্রায় কমে আসবে।

শিক্ষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, কুষ্টিয়া